মরণেরও পরে

আমার সোনার বাংলা

আমি তোমায় ভালবাসি

মনজিলুর রহমান

ধুৎ বোকা, 'আমায় মারবে কে ? আমি একজন ডাক্তার মানুষ । পল্লী চিকিৎসক হই, আর গ্রাম্য ডাক্তারই হই, ডাক্তার তো ? ডাক্তারদের কেউ মারে না। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিস না বড় বড় ডাক্তাররা রেড ক্রসের ফ্লাগ উড়ায়ে যুদ্ধাহতদের সেবা করে । ওরা মানবতার বন্ধু, ওদের কেউ মারে না। আমার ফ্লাগ লাগবে না, আমার ফ্লাগ এই গ্রাম। আমি এ গ্রামের ছেলে। কেউ তো আমার শত্রু নেই আর আমিও কারো শত্রু নই । আমি এ গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাব না। যদি আমায় কেউ মারতে আসে মারুক ' মরণেরও পরে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি । এদেশ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, এই সোনার বাংলাই হবে আমার শেষ ঠিকানা।" কথা গুলো শরৎ চন্দ্র সাহার । শরৎ চন্দ্র সাহা একজন পল্লী চিকিৎসক, একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ।

১৯৬৯ সাল । মামুন , তপন, রিয়া , রিপনসহ আরো অনেকে কচুয়া হাই স্কুল থেকে স্কুল মাধ্যমিক পাশ করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে গিয়ে ভর্তি হলো বাগেরহাট প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ বা পি সি কলেজে । তখন কচুয়া বাগেরহাট মহাকুমার একটি থানা । কচুয়া থেকে বাগেরহাটের দুরত্ব তা প্রায় ৮ / ৯ মাইল তো হবে । পি সি কলেজ ব্যতিত অন্য কোন কলেজ ছিল না এতদাঞ্চলে । তখন পি সি কলেজ টি এতদাঞ্চলে বেশ প্রসিদ্ধ । অবশ্য বর্তমানেও সে তার সুনাম বজায়

রেখেছে দেশ স্বাধীনের পর কলেজটি সরকারী হয়েছে।

mZx_ যারা স্কুল মাধ্যমিক পাশ করেছিল তার অধিকাংশই ভর্তি হলো এ কলেজে। সবাই যে কলেজে ভর্তি হলো তা নয় এদের মাঝে অনেকে খুলনা, ঢাকা, বরিশালসহ বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ভর্তি হলো। কেউ কেউ আবার পড়ালেখায় ইস্তফাও দিল। যারা ভর্তি হলো তাদের অনেকেই সীট নিল কলেজ হোস্টেলে।

মামুনের বাবা একজন মধ্যবিত্ত কৃষক মানুষ। পরের জমি বর্গা এবং পৈতৃক সামান্য ক'বিঘা জমাজমি চাষ-বাস করে সাধারণভাবে সংসার চলে যার। ছেলেকে কলেজ হোস্টেলে রেখে পড়ালেখা করাবেন এমন ভাবা তার কাছে বিলাসীতা মাত্র। কলেজে ভর্তি করে দিলেও মামুন বাড়ি থেকে কিছু রাস্তা হেঁটে, কিছু রাস্তা নৌকায় চড়ে এই ভাবে রোজ ৮ /৯ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কলেজ করতে লাগল।

মামুনদের বাড়ি কচুয়া সদরের পূর্ব দিকে। সদর পাড় হলেই পশ্চিম। এখানে বারুইখালি নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রাম চিরেই প্রত্যেক দিন কলেজ পৌঁছতে হয় তাকে।

সেদিন মামুন ডিস্টিক বোর্ডের রাস্তা ধরে বারুইখালীর মধ্য দিয়ে কলেজ যাচ্ছে। বারুইখালী ও হাজরাখালীর চৌমোহনা দিয়ে দু'দিকে দু'টো মেঠোপথ গ্রামের দিকে ধেয়ে গেছে। গ্রামের কতদিকে কত রাস্তাইত ধেয়ে যায়, কিন্তু এ চৌমোহনার আলাদা একটা বৈশিষ্ট আছে।

এ রাস্তার সংযোগস্থলে প্রাচীনকালের বিরাট বিরাট দু'টি বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে। আর সে বটচ্ছায়াকে ঘিরে সেখানে কয়েকটা দোকানও বসেছে। রয়েছে মধু সাহার চা বিস্কুটের দোকান। মধু সাহার চা এলাকায় খুবই জন প্রিয়। তার চা না খেলে অনেকের রাতে নাকি ঘুম হয়না বলে গ্রামে চাউর আছে। তাই সকাল সন্ধ্যে এ চায়ের দোকানকে ঘিরে বটতলা সবসময় লোকজনের সমাগম থাকে। এলাকাটি বুড়ীর বটতলা নামেও সবার কাছে পরিচিত। যাই হোক, সে গ্রাম্য মেঠো পথ ধরে সাদা হাফ সার্ট ও কালো প্যান্ট পড়া এক যুবক কলেজ নোট বুক হাতে দুলিয়ে দুলিয়ে ব্যস্ত ডিস্টিক বোর্ডের রাস্তার দিকে হেঁটে আসছে। সে যে এক কলেজগামী যুবক তা দেখলেই বোঝা যায়। গ্রামের যুবকরা সাধারণত লুঙ্গি পড়ে চলাফেরা করে সে তাদের ব্যতিক্রম। দৃশ্যত মনে হচ্ছে তপন সাহা তপু। আবার ভাবে তপু ? সে তো পিরোজপুরে ভর্তি হয়েছে, এদিকে যাবে কোথায় ? মামুন গিয়ে বটচ্ছায়ায় প্রতিক্ষায় থাকে দৃস্টি গোচর না হওয়া অবধি। দৃস্টির নাগালে এলেই বিস্মিত হয় এ যে তপু ! তারই প্রিয়বন্ধু। ওরা একই ব্যাচে কচুয়া হাই স্কুল থেকে পাশ করেছে। কাছে আসতেই উল্লসিত হয়ে ডাক দেয়,

আরে তপু ! তুই এদিকে ? কোথায় যাচ্ছিস ? এই তো কলেজ যাচ্ছি।

তুই না পিরোজপুরে ভর্তি হয়েছিস ? তা এই দিকে ?

হ্যাঁ হয়েছিলাম তো। সেখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে পি সিতে G‡mwQ। বাবা তার ডাক্তারী নিয়ে ব্যস্ত। মাও অসুস্থ। ছোট বোনটি সংসারের ঝুট ঝামেলা সামাল দিতে পারে না। সে এবার স্কুল মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে। যদি সংসার গৃহস্থতলী‡Z জোগান দেয় তাহলে তো তার পড়াশুনা ক্ষত হবে। তাছাড়া Zvর পড়াশুনায়ও হেলপে্র দরকার। পিসিতে পড়লে বাড়ি থেকে ক্লাশ করা যাবে এবং সময় অসময়ে বাবারও হেলপ হবে। আর বোন টিকেও তার পড়াশোনা একটু দেখিয়ে দেওয়া যাবে। এই চর্তুদিক হিসেব নিকেশ করে পি সিতে চলে এলাম। তুই রোজ এই পথে কলেজ যাস বুঝি ?

হ্যাঁ। আমিও তো বাড়ি থেকে কলেজ করি এবং এ পথেই যাই।

দুই বন্ধু আবারও এক সাথে ! বেশ ভালই হলো। আমি রোজ তোর জন্যে এই বটতলায় অপেক্ষা করব। তুই এলে এক সঙ্গে কলেজ যাওয়া যাবে।

"ঠিক আছে. বলল, তপন সাহা তপু।"

তপন চন্দ্র সাহা তপু হলো ডাক্তার শরৎ চন্দ্র সাহার ছেলে। ১৯৭০ সাল। তপনের বোন সবিতা সেবার স্কুল মাধ্যমিক পাশ করে দাদা তপনের সাথে পি সি কলেজে যেতে শুরু করেছে।

দেশে সাধারণ নির্বাচনের জোর হাওয়া বইছে। আওয়ামি লীগ, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী সবে নির্বাচনী যুদ্ধ মাঠে নেমে পড়েছে। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্রাধীন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের একক প্রতিনিধি হিসেবে আর্বিভূত হয়। কচুয়া, মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা নিয়ে সংসদীয় এলাকা খুলনা ৯৬| এ আসনে যথাক্রমে আওয়ামি লীগের মীর সাখাওয়াত আলি (দারু), জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা একেএম ইউসুফ এবং মুসলিম লীগ থেকে এ্যাডভোকেট আলতাফ হোসেন প্রতিদ্বন্দ্বীতা কা্রন। এ আসনেও আওয়ামী লী্গের মীর সাখাওয়াত আলি (দারু) বিজয়ী হন।

নির্বাচনে আওয়ামি লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করলেও প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁদের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর না করে কৌশল অবলম্ববন করেন। এদিকে নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ আওয়ামি লীগ ক্ষমতা হস্তা ন্তরের জন্য প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে চাপ প্রয়োগ করলে তিনি অনিদিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিয়ে তার সৈন্য-সামন্তগণকে বাঙালী জাতিকে ধ্বংসের জন্য লিলিয়ে দেয়।

২৫ মার্চ দিবাগত রাত্রে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ওরফে কসাই টিক্কার নেতৃত্বে পাকিস্তানী আর্মি ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ বাঙালীদের উপর চালায় গণহত্যা, লুটতরাজ, হত্যাযজ্ঞ। গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুকে তার ধানম ন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায়। এবং ঐ রাতেই তাকে নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। পাক-বাহিনী নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাপিয়ে পড়ে শুরু করে নৃশংস হত্যাকান্ড। বাড়িঘর পোড়ায়ে লুটপাত করে মহিলাদের ধর্ষণে মেতে উঠল তারা। এদের সঙ্গে জোট দিল জামায়েত, মুসলিম লীগ চক্র। অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে জামায়েতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। দক্ষিণাঞ্চলে তার সহযোগী ছিল মাওলানা একেএম ইউসুফ।

তিনি তখন খুলনা জেলা জামায়েতে ইসলামীর নেতা। তিনিই প্রথম খুলনা জেলায় ভূতের বাড়ি আনসার ক্যাম্পে রাজাকার বাহিনী গঠন করেন। মাওলানা একেএম ইউসুফকে সহায়তা দিতেন বাগেরহাটের মুসলিম লীগের নেতা ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন ও রজ্জব আলি ফকির। তাদের নেতৃত্বে কচুয়া, বাগেরহাট তথা বাগেরহাট মহকুমার থানায় থানায় রাজাকার বাহিনী গঠিত হলো। রজ্জব আলি ফকিরের ভয়ে এলাকার মানুষজন সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত থাকত। এমন কোন দিন ছিল না যে, " সে দুইচার জন মানুষ খুন করত।" এলাকায় তখন সে কসাই ফকির নামে পরিচিত হয়ে উঠে। ডাঃ মোজাম্মেল বেশ বয়স্ক এবং মুখে দাঁতও ছিলনা বেশ কয়েকটা কথা বলতে গেলে তোতলায়ে যেত। তার কথা ছিল লুট-পাট কর আর খাও। আর সেই কথাটি তার নিজের মুখে শোনাত এরকম, " লোদো পোদো খাও।" আওয়ামি লীগ পন্থী জনগনের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তাদের হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠল। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশীর ভাগই ছিল আওয়ামি লীগ তাই তারাই বেশী অত্যাচারিত হলো। তাদের ধন-সম্পত্তি গানি-মাতের মাল ঘোষণা দিয়ে তা লুট-পাট করতে লাগল। ভীতসন্ত্রস্ত হিন্দুরা আত্মগোপনে চলে গেল। এবং জীবন বাঁচাতে তারা দলে দলে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিল।

সমস্ত হিন্দুরা ভারতে যেতে রাজী থাকলেও ডাঃ শরৎ চন্দ্র সাহা কিছুতেই দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে রাজী ছিলেন না।তার কথা ছিল, " কে হিন্দু ? কে মুসলমান ? আমি বুঝি না। একজন মুসলমানের যেমন এদেশে জন্ম, আমারও তেমনি এদেশে জন্ম। এ দেশ যেমন তাদের, আমারও। মরতে হলে আমার জন্মভূমিতেই মরব। আমি হিন্দু এটা আমার কাছে মূখ্য নয়, আমার কাছে আমার দেশ, আমার জাতি। সবচেয়ে বড় কথা হলো আমি একজন চিকিৎসক। মানুষের সেবা করাই হলো আমার ধর্ম। এলাকার মানুষের এ দুর্দিনে আমি নিজের জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে পরিনা।"

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেলেও মামুন ও তপনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। ইতিমধ্যে তারাও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতে যাবে মুক্তি যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে।

গভীর রাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে মামুনের ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলেই দেখলে, তপন ও তার বোন সবিতা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে,

মামুন তাকে জিজ্ঞেস করল, " এত রাতে ?

" আমাদের ওদিকে আর থাকার জো নেই। দিন দিন রাজাকার আলবদরের হামলা বাড়ছে। মা বোনদের ইজ্জত হানি হচ্ছে। তাইতো বোনটিকে নিয়ে পালিয়ে এলাম তোদের বাড়িতে। বাবাকে এত করে বললাম, " চল আমরা ভারতে পালিয়ে যাই।" সে ভদ্রলোক কিছুতেই রাজী না। তার কথা একটিই, " মরণেরও পরে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। এই সোনার বাংলাই হবে আমার শেষ ঠিকানা।"

যাক, ভাল করেছিস। আয় ভিতরে আয়।

তাদের কানাঘুষার শব্দে মামুনের বাবার ঘুম ভেঙে গেল। সে জিজ্ঞেস, এত রাতে কার সাথে কথা বলছিস রে মামু ?

মামুন জবাব দিল। " আমার বন্ধু তপন ও তার বোন সবিতা।"

এত রাতে ?

" ওদের ওদিকে রাজাকার পাকসেনারা খুব হামলা করছে। মা বোনদের ইজ্জত হানি হচ্ছে। তাই সে বোনটিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে আমাদের বাড়ি।" জবাব দিল মামুন।

" ঠিক আছে ভাল করেছে। আর কথা না বাড়ায়ে ওদের পাটাতনে বিছান করে সেখানে শোবার ব্যবস্থা করেদে। পাশের ঘরের কেউ টের পেলে বিপদ হতে পারে? " বলল মামুনের আব্বা।

মামুনদের বাড়ি কয়েকদিন আত্মগোপনে থেকে অবশেষে এক রাতের আঁধারে দুই ভাই বোন ভারতে পালিয়ে গেল। মামুন তাদের সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

মামুনও একদিন দেশ ত্যাগ করে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিল।

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ শেষে দেশ যখন স্বাধীন হলো দেশের টানে দেশে ফিরে এলো তপন। আর মামুনও এ সময় যুদ্ধ ফেরত মুক্তিযোদ্ধা। দেখা গেল পুরো হিন্দুপাড়াটাই বিরানভূমি। পোড়াবাড়ি আর লাশের গন্ধ ধ্বংস যজ্ঞের চিহ্নগুলো রয়ে গেছে তখনও। দু'দিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে তপন জানল বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে পাকসেনারা। দূরের গ্রামে এক অনাত্মীয় আওয়ামি লীগার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে মা। সেও সেখানে গিয়ে উঠল।

একদিন দেখা করল মামুনের সাথে। তপনকে কাছে পেয়ে মামুন আনন্দে কেঁদে ফেলল। তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কিরে তপু, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড কেমন আছিস?

এই তো দেখতে পাচ্ছিস। যুদ্ধবিধস্ত দেশে সবাই যেমন থাকে ? কেউ বাবা হারা, কেউ ভাই হারা, কেউ বোন হারা, আমিও আছি তাদেরই মত।

তা কবে ফিরলি ইন্ডিয়া থেকে ? তোর মা বাবা, বোন তাদের খবর কি ?

তপন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, " দুঃখ কষ্ট সয়ে মা এখনও বেঁচে আছেন। বোনটা ভালই আছে, সে ইন্ডিয়াতেই রয়ে গেছে। সেখানে তাকে বিয়ে দিয়ে এসেছি। কিন্তু বাবা; বলে সে থেমে গেল।

মামুন উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, " বাবা ? তোর বাবার কি হয়েছে ?

জানি না ! দোস্ত জানি না! বাবার কপালে কি হয়েছে ? তার সন্ধান কেউ দিতে পারল না। তিনি বেঁচে আছেন কি মারা গেছেন ? মার কাছে শোনলাম তার কাহিনী :
" মেঘলা রাত্রি। আকাশে মাঝে মধ্যে বিদুৎ চমকাচ্ছে দু' চার ফোটা বৃষ্টিও পড়ছে। কোথাও যেন কেউ নেই রাজাকার আলবদরের

ভয়ে যে যার ঘরের বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। সারাদিনের কর্ম শেষে তোর বাবাও তার ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিয়েছেন। আর আমি তার শিয়রে বসে পান চিবুচ্ছি । একটু পরে আমিও শুয়ে পড়বো । এমন সময় কোন এক আগন্তকের সাড়া পেয়ে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গেল সেই দিকে । সেদিক থেকে ক্ষীণ গলায় ভেসে আসছে,

শরৎ বাবু , ডাক্তার শরৎ বাবু বাড়িতে আছ নাকি ?
আমি তোর বাবাকে বললাম , “ শোন ঐ তোমায় কে ডাকছে ? কুকুরগুলো তাকে তাড়া করেছে বোধহয় সাহায্য চাইছে।

তোর বাবা বলল ,“ ওতো মুন্সি , ওই পাড়ার আহমেদ মুন্সি ।”

সে হাঁক দিল মুন্সি তোমার ভয় নাই আমি আসছি । কি খবর বাড়িতে কারো অসুখ করেছে নাকি ?

না কারো অসুখ নয় । তুমি এদিকে এস তোমার সাথে জরুরী কথা আছে ।

ঠিক আছে আমি আসছি ।

হ্যারিকেন হাতে ধীরে ধীরে তোর বাবা সেদিকে গেল। কিছুকক্ষণ পরে এসে আবার শুয়ে পড়ল। দেখলাম তার মুখটা মলিন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,“মুন্সি কেনএসেছিল ? কি বলল ?”

সে আমাকে বাড়ি থেকে পালায়ে যেতে বলে।তার ছেলে রাজাকার। তার মাধ্যমে আমার সম্পর্কে ক্যাম্পে নাকি কি শুনেছে ?

কি শুনেছে ?

ওরা নাকি আমায় মেরে ফেলতে চায়।

কারা ?
রাজাকারেরা ।

“ কেন?”

“ আমি নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করি।”

তাহলে এখন কি হবে ? তুমি এখনই বাড়ি থেকে পালাও ।

সে কি শুনতে কি শুনেছে ? তারা আমায় মারবে কেন? আমি কি কারো ক্ষতি করছি নাকি? তুমি এখন ঘুমায় তো কাল সকালে দেখা যাবে ।

তোর বাবার জীবনে আর সকাল হলো না। সে হ্যারিকেনটা কেবল নিভিয়েছে এমন সময় পাঁচ ব্যাটারি ফ্লাস লাইট জ্বালতে জ্বালতে তিন চারজন লোক তোর বাবার নাম ধরে উগ্রকন্ঠে ডাক দেয় ,

শরৎ বাবু, শরৎ বাবু ? ডাক্তার শরৎ বাবু। বাড়ি আছ ?

উগ্রকন্ঠে ডাক শুনে আমার বুকের ভিতর ছ্যাদ করে উঠল । তোর বাবার দিকে চেয়ে দেখি তার মুখটাও শুকিয়ে গেছে ।

ভগবানের নাম জপতে জপতে উঠে দাঁড়াল । দরজা খুলতে না খুলতেই হুড়মূড় করে জনকয়েক লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল । তাদের গায়ে খাকী শার্ট ও প্যান্ট মাথায় ক্যাপ। বাহিরে শোনা যাচ্ছে আরও কয়েক জনের গুন্জন। আমিও তোর বাবার পিছে পিছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “ কি হয়েছে আপনারা অমন করে ওনাকে ডাকছেন কেন ?

একজন বলল, “ কমান্ডার সাহেবের ছেলের অসুখ । তাই আমাদের সঙ্গে তাকে ক্যাম্পে যেতে হবে।

এ কথা শুনে তোর বাবা ঔষধের বাক্স নিতে গেলে ধমক দিয়ে বলল,“ আপনাকে ঔষধ নিতে হবে না, তারাই আপনার ঔষধ দিবেন , আপনি চলেন।”

বাহির থেকে আওয়াজ এলো, শ্যালেকো মিলা কি ন্যেই?
ইয়েস স্যার অপারেশন সাকসেস , বলে উঠল একজন।

সো হোয়াই ইউ ওয়েট ফর ? জলদি ল্যেকে আও ।

এক রকম ধাক্কা দিয়ে তোর বাবাকে বাহিরে নিয়ে গেল । আমিও তার সাথে সাথে দরজা পর্যন্ত গেলাম । আরও যেতে চাইলে আমাকে বাধা দিয়ে বলল, “ এই বুড়ী তোমায় আসতে হবে না। কমান্ডারের ছেলেকে দেখে কাল সকালেই বাড়ি ফিরবে। যাও ঘুমিয়ে পড়গে ।” সারারাত জেগে কাটালাম । সকাল গড়িয়ে দুপর হলো তোর বাবা আর ফিরল না। সে কি মরে গেছে , নাকি বেঁচে আছে কেউ জানে না। তার লাশ পর্যন্ত কেউ দেখতে পায়নি কোথাও ?”

“ তা হলে এক কাজ কর ? চল, আহমেদ মুন্সির সাথে গিয়ে দেখা করি । তোর বাবার নিখোঁজ রহস্য সে হয়তো জানতে পারে ?” বলল মামুন।

একদা মামুন ও তপন আহমেদ মুন্সির বাড়ি গিয়ে পৌঁছিল। প্রকৃত নাম আহমেদ শেখ। স্হানীয় মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। বর্তমানে মসজিদে ইমামতি করেন। তাই তিনি এলাকায় আহমেদ মুন্সি নামে সবার কাছে পরিচিত। চার পাঁচটি শরিক নিয়ে বেশ বড় সর একটি বাড়ি। সুপারী পাতার বেড়া দিয়ে বাড়িটি ঘেরা । মনে হয় বেশ সুপারী হয় এ বাড়িতে। বাড়ির সামনে বড় একটি পুকুর। পুকুরের পাড় দিয়ে সরু ক্ষীণ ক্ষীণে একটি রাস্তা বাড়ির ভেতর চলে গেছে । এটাই এই বাড়ির সদর দরজা ।এ দরজা দিয়েই মামুন ও তপন বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বাড়ির আঙিনায় বালক-বালিকারা কানামাছি, গোল্লাছুট , বৌছোঁয়া বিভিন্ন খেলা খেলছিল। আর বউ-ঝিরা বিভিন্ন কাজ কর্মে ছিল ব্যস্ত। অপরিচিত দুইজন যুবককে বাড়িতে ঢুকতে দেখে তারা মাথায় ঘোমটা টেনে যে যার আড়াল হলো। বালক বালিকারা খেলা বন্ধ করে এসে ভীড় করলো তাদের সামনে ।

মামুন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করল , “ এটা কি আহমেদ মুন্সির বাড়ি ?”
আট দশ বছরের একটি ছেলে জবাব দিল, “ হ্যাঁ। হাত উঁচিয়ে আঙুল নির্দেশ করে করে দেখাল, “ ঐ যে বড় টিনের ঘরটা দেখছেন ওটা তার ঘর।” পাশে দাঁড়ানো একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে ,“ এই তো তার পৌত্রী । ” মেয়েটাকেও বলল,“ ও হীরা এরা তোর দাদার খোঁজে এসেছে ।”

মামুন হীরার দিকে তাকিয়ে দেখে ,“ বালক টির চেয়ে দুই এক বছরের ছোট একটি মেয়ে। লাল টুকটুকে একটা পাজামা আর গায়ে ছাপা রংয়ের ফ্রগ । ফ্রগটি মাঝে মাঝে ছিঁড়ে গেছে তাতে রিপু করা।

হীরা জবাব দিল, “ দাদা তো বাইততে নেই, ক্ষেতে গেছে আনাচ তুলতে । আপনারা দাঁড়ান আমি দাদারে ডাইকা আনি।”

এই বলে হীরা সেখান থেকে দৌড় দিল তার পিছে পিছে গেল আরো দুই তিনজন ।

কিছুক্ষণ পরে মাথায় একটা বড় ঝুড়িতে মূলা, বেগুন, টমেটো, উচ্ছে প্রভৃতি সব্জী ভর্তি আহমেদ মুন্সি বাড়ির দিকে আসতে লাগলেন। কাছা-কাছি আসতেই মামুন সালাম দিল, “ আসসালামু ওয়ালাইকুম।”

প্রত্তুতরে মুন্সিও জবাব দিল, “ ওয়ালাইকুম আসসালাম।”

তপনকে সামনে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,“ কেমন আছিস তপু? ওপার থেকে কবে আসলি? তোর মা বোন কেমন আছে ? মামুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “বাবাজীকে তো চিনলাম না ?”

আপনাদের দোয়ায় ভাল । মা বোনও ভাল আছে। সে আমার বন্ধু মামুন , যুদ্ধফেরৎ মুক্তিযোদ্ধা।

“ মুক্তিযোদ্ধা” শব্দটা শুনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে মুন্সি বলে উঠলেন, “ মুক্তিযোদ্ধা ! বাংলা মায়ের গর্বিত সন্তান, বঙ্গীয় গাজী ।” তা কি মনে করে এই ঘৃনিত রাজাকারের বাড়িতে। বাংলার মুক্তি সংগ্রামে জিন্দেগী ভর শেখ মুজিবের দল করেও জীবন সায়াহ্নে এসে ঘৃন্য রাজাকারের পিতৃ পরিচয়ে দাঁড়িয়েছি কবরের পাশে।

আপনি অনর্থক নিজেকে অত ছোট মনে করছেন কেন ? কাকা। আপনার ছেলে যে ইচ্ছাকৃত ভাবে রাজাকারে যায়নি সে যে পরি স্হিতির শিকার তা এলাকার সবাই জানে,বলল তপন।

একটা দীর্ঘ নিঃস্বাস নিয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ সবাই জানে । “ সে দিন সোমবার কচুয়া হাটের দিন। সফিক হাটে গেছে রাত দশটা অব্দি সে আর হাট থেকে বাড়ি ফেরে না। এর দুই দিন আগে কচুয়ায় পাক সেনারা এসে ক্যাম্প করেছে সিও অফিসে । খবর পেলাম হাট থেকে ফেরার পথে তারা সফিকসহ আরো অনেককে ধরে নিয়ে গেছে তাদের ক্যাম্পে । তোর চাচি, আমি , পাড়াশুদ্ধ সবাই উদবিগ্ন । কি জানি কি হয়? সকালে শোনা গেল যাদের ধরেছিল সবাইকে খুলনায় নিয়ে গেছে । আমাদের এলাকায় জামায়াতে ইসলামী থেকে সাংসদ প্রার্থী ছিল মাওলানাএকেএম ইউসুফ । শোনলাম সে নাকি রাজাকার সংগ্রহে বিভিন্ন এলাকা থেকে তরুণদের ধরে ধরে রাজাকারে ভর্তি করছে ।

পরের দিন খুলনায় গেলাম।দেখা গেল মাওলানা ইউসুফ ভূতের বাড়ি আনসার ক্যাম্পে রাজাকারদের টেনিং নিয়ে ব্যস্ত আছেন। মনে বড় আশা নিয়ে তার সাথে দেখা করলাম, “ কেননা ইলেকশনের সময় মাওলানা ইউসুফ আমাদের এলাকায় এলে তার দলবলদের কয়েকবার চা মুড়ি ডাব খাওয়ায়েছি নিশ্চয় তিনি তা আজও ভুলতে পারেননি । ওরে বাবা নিমক হারাম আমাকে চিনলই না ।” তবুও জোর করে পরিচয় দিয়ে বললাম, “ আমার ছেলেকে আপনার লোকেরা ধরে নিয়ে এসেছে ওর মা অসুস্হ ছোট্ট কচি একটা মেয়ে সারাদিন আব্বা আব্বা করে তাকে ছেড়ে দিন। ”

ছেড়ে তো দিলনা উল্টো বিজ্ঞের মত শোনাল, “ আমাদের দেশের আজ দূর্দিন । হিন্দু-স্তানিরা এদেশকে তাদের তাবেদারি সরকার বানাতে চায় । তাদের বিরুদ্ধে আমরা জেহাদ ঘোষণা করেছি । এদেশকে কিছুতেই হিন্দু স্তানের তাবেদারি সরকার হতে দেওয়া যাবে না। দেশের এই দূর্দিনে সফিকদের মত জোয়ান আমাদের দরকার যারা কিনা হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে। ” শেষে আমাকে আরো সতর্ক করে দিল, “ সফিক যদি আমাদের বাহিনী থেকে পালিয়ে

যেতে চায় আর যদি ধরা পড়ে তার পরিণাম হবে হিন্দুস্তানের দালালদের যা হয় তাদেরই মত। আর আপনার বাড়ি-ঘর জ্বলে পুড়ে ছার খার হয়ে গেলে আমাকে কিন্তু দায়ী করতে পারবেন না। ”

১৬ ডিসেম্বর নিয়াজী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করলে কচুয়া থেকে সমস্ত রাজাকার পাকবাহিনী ক্লজ করে খুলনা নিয়ে গেল। সেই থেকে অদ্যাবধি কোন সন্ধান মেলেনি সফিকের। “ জানিনা যাদু আমার কোথায় ?”

সে যাই হোক তোমরা কেন এসেছ তাই বলো?

তপন বলল , আমার বাবা ; মানে বাবার তো কোন খোঁজ খবর নেই। কেউ জানেনা তিঁনি বেঁচে আছেন কি মারা গেছেন? মা বললেন আপনারই সাথে তার শেষ কথা হয়েছিল ।তাই জানতে এসেছি তার নিখোঁজ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কিনা ?

হ্যাঁ আমি জানি । আমার চোখের সামনেই তোর বাবাকে হত্যা করেছে হারামজাদারা । কথাটা থামিয়ে তিনি বললেন তা এখানে কেন ? চল বারান্দায় গিয়ে বসি।

তপন ও মামুন বারান্দায় এসে দুই জনে দুইটা চেয়ার নিয়ে বসল। আহমেদ মুন্সিও আরেকটা টেনে তাদের সামনাসামনি বসল। হীরা এসে তার দাদার গা ঘেঁসে দাঁড়াল । মামুন ও তপনের দিকে তাকিয়ে দাদাকে জিজ্ঞেস করল, “ দাদু এরা কারা ?”

দাদু জবাব দিলেন,“ সে মুক্তিযোদ্ধা , যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে।”

আমার আব্বুও তো যুদ্ধে গেছে, “ সবাই ফিরে এসেছে যুদ্ধের মাঠ থেকে । সে তো আজও ফিরল না। আব্বুর জন্য আমার পরাণ পোড়ে, দাদী সব সময় কাঁদে , তুমিও তো মাঝে মাঝে কাঁদো তাই না দাদু।” সে মামুনের উদ্দেশ্য বলল, “ আপনি তো দেশ স্বাধীনের যুদ্ধ করেছেন? আমার আব্বুর সাথে কি আপনার দেখা হয়েছে ? আপনি কি জানেন সে কবে বাড়ি আসবে ? ”
মামুন কি জবাব দিবে এই অবুজ শিশুটিকে ? “ মুক্তিযোদ্ধা রাজাকারের পার্থক্য যার কাছে অজানা । এক বুক আশা নিয়ে প্রতিক্ষায় আছে সবার বাবার মত তার বাবাও একদিন ফিরে আসবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে । বাবা তাকে কোলে নিবে, আদর করবে, খেলনা কিনে দিবে আরও কত কি ?”

সে শুধু নিরবে মাথা নিচু করে বলল, “ না মামনি তার সাথে আমার দেখা হয়নি।”

হীরা মামুনকে আরো কিছু বলতে চেয়েছিল এমন সময় তার দাদু বলল,“ যা তো ঘরের ভিতর তোর দাদীকে গিয়ে বল এদের জন্য কিছু চা নাস্তার ব্যবস্হা করতে । ”

হীরা ঘরের ভিতর চলে গেলে আহমেদ মুন্সি বলতে শুরু করল, “ আমার তারিখটা মনে নেই তবে দিনটা ছিল শনিবার। তোর চাচি গেল কচুয়ায় রাজাকার ক্যাম্পে সফিকের সাথে দেখা করতে। সফিক তার মার কাছে গোপনে বলল, “ বাগেরহাট থেকে রজ্জব আলি ফকির এসে-ছিল শরৎ কাকা সর্ম্পকে শলা পরামর্শ হয়েছে তার বিপদ আসন্ন সে যেন শীঘ্র বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় এবং আব্বাকে বলো সে যেন অবশ্যই তাকে সর্তক করে দেয়।” দিনের বেলায় তোর বাবার সঙ্গে তো আমি দেখা করতে পারিনা তাই সন্ধ্যার পর পরই তার সাথে দেখা করতে গেলাম।বিকাল থেকে আকাশটা মেঘলা মেঘলা সন্ধ্যার দিকে আরো ঘনিভূত হয়ে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হলো । মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছিল।পাড়া প্রতিবেশী কারো ঘরে আলো নেই , স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলে মেয়েরাও রাত জেগে পড়ছে না। ওরাও আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে । দুই ব্যাটারির একটা ফ্লাস লাইট হাতে আস্তে আস্তে তোদের বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছি তোদের ঘরে আলো তখনও জ্বলছিল । বাড়িতে ঢোকা মাত্র কুকুরগুলো আমার দিকে তেড়ে আসল । নিচু গলায় তোর বাবাকে ডেকে আনলাম।
সেই প্রথমে আমায় জিজ্ঞেস করল, “ কি মুন্সি এত রাতে, কি খবর ?

সফিক তার মার কাছে যে গোপন খবরটা বলেছিল তা আমি বিস্তারিত তাকে জানালাম। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলনা যে তার ব্যাপারে এমন একটা সর্বনাশি সিদ্ধান্ত হতে পারে।

সেই উল্টো আমাকে বুঝাল, “ তুমি অনর্থক উদ্বিগ্ন হচ্ছ মুন্সি আমাকে মারবে কেন ? আমি কি কারো ক্ষতি করেছি কোনদিন ? নাকি আমার পূর্বপুরুষেরা কারো ক্ষতির কারণ ছিল ? আমি একজন ডাক্তার মানুষ ।”

সেই ডাক্তারীই তোমার বিপদের কারণ। তাদের কাছে রির্পোট গেছে তুমি নাকি মুক্তি যোদ্ধাদের চিকিৎসা করছ।

মানব সেবাই ডাক্তারের ধর্ম। সে মুক্তিযোদ্ধা হোক আর রাজাকারই হোক। তাছাড়া আমি আমার গ্রাম ও গ্রামের মানুষদের ভালবাসি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে সরকারী ডাক্তারেরা এলাকা ছেড়ে যে যার বাড়ি চলে গেছে অথবা ভারতে পালিয়েছে। দেশের এই দুর্দিনে এলাকায় কোন ভাল ডাক্তার নেই । সে আমিই তাদের একমাত্র ভরসা। আমিও যদি পালায়ে যাই তবে তাদের পাশে দাঁড়াবার তো কেউ থাকলনা। এই তো ঐ পাড়ার মনা সিকদারের ছেলের খুব জ্বর মনে হয় নিউমো-নিয়া হয়েছে কাল সকালে তাকে একটা ইনজেকশান দিতে হবে। তা না হলে তাকে বাচাঁনো যাবে না। ”

তুমি আছ তোমার সেবা আর এলাকা নিয়ে । তোমার নিজের জীবনের কথা একটু ভেবে দেখেছ ?

তুমি তো জান মুন্সি আমার সেই একই কথা, “ মরণেরও পরে আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।এদেশ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না , এই সোনার বাংলাই হবে আমার শেষ ঠিকানা।” তুমি এত করে যখন বলছ তখন কাল সকালে চিন্তা ভাবনা করব দেখি কিছুদিন গাঢাকা দিয়ে থাকা যায় কিনা । তবে মনা সিকদারের ছেলেটাকে ইনজেকশান দিয়ে ।

তোর বাবার সাথে কথা বলে কয়েক কদম পা সামনে বাড়ায়েছি এমন সময় দেখলাম পাঁচ ব্যাটারী লাইট ফ্লাস করতে করতে ৩/৪জন লোক খাকী পোশাকে তোদের বাড়ি ঢোকছে । আকাশে বিদ্যুৎ তখনও চমকাচ্ছিল । বুঝতে পারলাম সর্বনাশ হয়ে গেছে তোর বাবাকে ওরা

এবার রেহাই দেবে না । আমি নিজেকে আড়াল করে একটি ঝোপের আড়ালে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম তাকে নিয়ে তারা বেড়িয়ে আসছে। তোর বাবা চলছে আগে আগে আর ওরা তার পিছে পিছে। তোদের বাড়ির পশ্চিম ধারের খাল পেরিয়ে কচুয়া যেতে হয় তাই না ? তোর বাবা যখন খাল পার হতে বাঁশের সাঁকোর মাঝামাঝি গেছে এমন সময় রাইফেলের গুলির একটা আওয়াজ হলো গুরুম অমনি খালের জলে শব্দ পেলাম ঝপ । আমার আর বুঝতে বাকি থাকল না যে খালের জলে ঝপ করে যে শব্দ হলো তা তোর বাবার লাশ বৈ কিছু নয়। ভয়ে কলিজা আমার কেঁপে কেঁপে উঠছে । লাইট ঘুরিয়ে যদি আমার ছায়াও দেখতে পায় আমার দেহটাও তোর বাবার মৃতদেহের মত লুটিয়ে পড়বে এই জঙ্গলে । রাজাকারের বাবা বলে ক্ষমা করবে না। আমি ভেবে পাচ্ছি না এ মূহুর্তে আমার কি করা উচিৎ ? খালে তখন ভাঁটা । আর কিছুক্ষণ পরে শরতের লাশটা ভেসে যাবে নদীতে । ভাসতে ভাসতে গিয়ে উঠবে কোন এক অচিন গাঁয়ের নদী চরে । পচে গলে একদিন তা শিয়াল শকুনের খাদ্যে পরিনত হবে। বাল্যকালের সহপাঠী, একজন খাঁটী দেশ প্রেমিক, যার সাথে একই খেলার মাঠে খেলেছি, একই হাটে হাট করেছি । তার লাশের কিনা আজ এমন দশা , তা কেমনে হয় ? ঘাতকদল চলে গেলে ঝোপের আড়াল থেকে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম। যখন লাইট ফ্লাস করতে গেলাম দেখি আমার হাতে লাইট নেই। ভয়ে কখন যে হাত থেকে কোথায় ছিটকে পড়েছে টেরই পাইনি । তা আর খুজে পেলাম না। বিদ্যুতের আলোতে আস্তে আস্তে খালের পাড়ে গেলাম । মালকোঁচা মেরে নেমে পড়লাম খালে । অন্ধোকারে পরিস্কার দেখতে পেলাম রাইফেলের একটি বুলেট তোর বাবার বক্ষ ভেদ করে চলে গেছে। রক্তে রাঙা খালের পানি তখনও বয়ে যাচ্ছে ভাঁটিতে। লাশটি উপরে তুলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ; পারলাম না। কোমর থেকে গামছা খুলে লাশটা সাঁকোর বাঁশের সাথে বেঁধে রেখে ফিরে গেলাম বাড়িতে। খোন্তা কোদাল আর ডেকে নিলাম তোর চাচিকে । স্বামী -স্ত্রী দুই জনে মিলে লাশটা তোললাম খালের জল থেকে । তারপর ঝোপের আড়ালে মাটি খুড়ে গর্ত করে সে গর্তে রেখে মাটি চাপা দিয়ে দিলাম তোর বাবার লাশটা। সাঙ্গ হলো একজন দেশ প্রেমিকের ভবলীলা।“ মরণেরও পরে সোনার বাংলাই হবে আমার শেষ ঠিকানা ।” শরতের শেষ আর্জি। সেই শেষ ঠিকানায়ই রেখে দিলাম তাকে যেখান থেকে কেউ কোন দিন তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তার সে কন্ঠ আজও আমার হৃদয়ে বেজে ওঠে, “ মরণেরও পরে আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।” বলতে বলতে আহমেদ মুন্সির দু’চোখ অশ্রু ছল ছল হয়ে উঠল ।

না, কাকা আপনি অমন করে কাঁদবেন না । আপনি আমার বাবার বন্ধু । আপনার চোখে জল এলে তাঁর আত্মায় কষ্ট পাবে ।বলতে বলতে তপুর নিজের চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠল । কান্না বিজরিত কন্ঠে বলল, চলেন। মুন্সি জিজ্ঞেস করল , “ কোথায় ?”
যেখানে আমার বাবা ঘুমিয়ে আছে ।

“ ওদিকে তোর চাচি তোদের জন্য চা নাস্তার ব্যবস্থা করতে গেছে একটু খেয়ে যা।”

তা, পরে দেখা যাবে । আপনি আগে চলেন বলে তপন উঠে দাড়াল ।

মামুনও উঠে পড়ল।

অগত্যা তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, “ তা হলে চলো।” আহমেদ মুন্সি খালপাড়ের সেই ঝোপের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন। তপন ও মামুন তাকে পিছে পিছে অনুসরণ করল।

লেখক : সাংবাদিক , কলামিস্ট। জর্জিয়া ব্যুরো প্রধান সাপ্তাহিক বর্ণমালা, নিউইর্য়ক।

আটলান্টা , জর্জিয়া
মার্চ ১, ২০০৯।

২০০৯ এ বাংলা একাডেমীর বই মেলায়
মনজিলুর রহমান এর উপন্যাস প্রকাশ করেছে নির্বাচিতা প্রকাশন

আপনি এক কপি পেতে চান ?
লিখুন rahmanbornomala@gmail.com